ব্রুট মেজরিটি

লিখেছেন **আসিফ নজরুল**

চ্যানেল আই-এর একটি অনুষ্ঠান শেষে কথা হচ্ছিল বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে। তিনি তারেক জিয়া প্রসঙ্গে কিছুটা বিরক্ত। আরো বিরক্ত তাকে ঘিরে বিএনপি ও সিনিয়র নেতাদের 'কৃত্রিম' উচ্ছ্বাস নিয়ে। আওয়ামী লীগ নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সেটিই বলেছেন প্রকাশ্যে। তার কাছে ভালো লাগেনি তারেক জিয়ার পাশে তার পুরনো বন্ধু মান্নান ভুঁইয়ার ছবি।

আবদুল্লাহ আল নোমান, হারিস চৌধুরী, সেলিমা রহমানদের ডিঙ্গিয়ে তারেক জিয়া একবারে হয়েছেন বিএনপি'র ১ নং যুগ্ম মহাসচিব। তার পেছনে ভিড় করেছেন আমানুল্লাহ আমান, জহিরুদ্দিন স্বপন, সালাউদ্দিন আহমেদের মতো এককালের ঝানু ছাত্রনেতারা। তার জন্য দলের কার্যালয়ে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন মান্নান ভুঁইয়া, মীর্জা আব্বাস, সাদেক হোসেন খোকা মাপের বিএনপি নেতারা। এটি বিশেষ করে বিএনপি বিরোধীদের কাছে বেমানান এমনকি বিদঘুটে মনে হতে পারে।

সংসদে ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেট অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী

কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতির নিকট অতীত স্মরণ করলেও তা মনে হওয়ার কথা নয়। সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের দলের বয়োবৃদ্ধ নেতারা কন্যাসম শেখ হাসিনার আধিপত্য মেনে নিয়েছেন সর্বান্তকরণে। সত্তরোর্ধ্ব জিল্লুর রহমান শেখ হাসিনাকে গান্ধী, লিংকন, ম্যান্ডেলার সঙ্গে তুলনা করার মতো নির্লজ্জ চাটুকারিতা করেছেন। তার কাছাকাছি তোষামুদি করেছেন আওয়ামী লীগের আরো বহু নেতা। বিএনপি-তে মীর্জা গোলাম হাফিজ, মুস্তাফিজুর রহমান আর মাজেদুল হক-রা যখন থেকে খালেদা জিয়ার সামনে অধোবদন হয়ে থেকেছেন তখনকার তিনি বয়েসে খুব বেশি বড় ছিলেন না আজকের তারেক জিয়ার চেয়ে।

তারেক জিয়ার উত্থান বরং দুই নেত্রীর চেয়ে কিছুটা নিয়মতান্ত্রিক। তিনি তাদের মতো একবারে দলের শীর্ষনেতা হয়ে বসেননি। খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে তা সম্ভবও নয়। ১ নং যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে তাকে মনোনীত করার পেছনে বরং আগের তিনটি নির্বাচনে তার অবদানের কথা বলা হচ্ছে। এই প্রচারণায় কিছুটা অতিরঞ্জন

রয়েছে। নব্বই-এর নির্বাচনের আগে পরে সাপ্তাহিক বিচিত্রার সাংবাদিক হিসেবে বিএনপি'র কার্যালয়ে আমার প্রায় নিয়মিত যাতায়াত ছিল। বিএনপি'র কোনো পর্যায়ের নেতাদের কাউকে কখনো তখনকার বাইশ বছরের তরুণ তারেক জিয়ার নাম উচ্চারণ করতে শোনা যায়নি সেসময়।

তারেক জিয়া সত্যিকারের অবদান রেখেছেন সর্বশেষ সংসদ নির্বাচনে। তারপরও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে তার উত্থান অনেকটাই যে পারিবারিক পরিচয়ের জন্যই তা মনে না হওয়ার কারণ নেই। এটিই বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের রাজনীতির ধারা ও বৈশিষ্ট্য। রাজার ছেলে রাজা দু'হাজার বছর আগে থেকে এখানকার মানুষ তাই জেনে এসেছে। রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়েছে বহু আগে, সেই জেনে আসা এবং মেনে নেয়ার এ্যাটিচুড ম্লান হয়নি একটুও। তাহলে তারেক জিয়ার উত্থানে আশঙ্কা কেন?

উত্থানের প্রেক্ষিত

তারেক জিয়ার উত্থান নিয়ে নীরব আশঙ্কার কারণ অন্যখানে। তিনি দলের প্রকাশ্য নেতৃত্বে এসেছেন রাজনৈতিক জল্পনা কল্পনার জন্য খুবই উর্বর এক সময়ে। প্রেসিডেন্ট বি, চৌধুরীর ইমপিচমেন্ট-এর দাবি উত্থাপিত হয় দলের যে পার্লামেন্টারি পার্টির মিটিং-এ, সেখানেই দাবি ওঠে তাকে দলের চেয়ারম্যান করার। তার দিনকয়েক আগে তারেক জিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন হাওয়া ভবনের নেপথ্য ক্ষমতা নিয়ে আওয়ামী লীগ এবং কিছু পত্রিকার আশঙ্কাকে খন্ডন করার জন্য তারেক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন। তারেকের দাবি ছিল তিনি কোনো অনিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। তিনি তাকে জিয়া-খালেদা জিয়ার পুত্র হিসেবে না দেখে তার ব্যক্তি পরিচয়ে দেখার অনুরোধও করেছিলেন সাংবাদিকদের কাছে। তখন পর্যন্ত তিনি দলের কোনো নেতা নন, সরকারের কেউ নন। সাংবাদিকরা কেউ তাকে প্রশ্ন করেনি তাহলে তার সাংবাদিক সম্মেলনে তিন প্রতিমন্ত্রী উপস্থিত থেকেছেন কেন? এটিই কি তার আনডিফাইনড ক্ষমতার একটি প্রতিফলন ছিল না?

তারেকের 'আনডিফাইনড' ক্ষমতার আরো উদাহরণ দেয়া হয় পত্রপত্রিকায়। বিএনপি যে দাতা দেশ ও গোষ্ঠীর চাপকে অগ্রাহ্য করে যে সুবিশাল মন্ত্রিসভা গঠন করেছে তা তারেকের অনুগত তরুণ নেতাদের একোমোডেট করার জন্যই। মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী হিসেবে ঠাঁই পাওয়া এসব নেতাদের অনেকেই মন্ত্রীদের কার্যক্রমের ওপর ওয়াচডগের ভূমিকা পালন করেন। তারেকের তত্ত্বাবধানে তৈরি মন্ত্রীদের পারফর্মেন্স রিপোর্ট পাঠানো হয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তারেকের হাওয়া ভবন বহু গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারেক এই নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তার কয়েক দিনের মধ্যে তাকে দলের শীর্ষ নেতৃত্বে নিয়ে আসার জন্য যে আলোড়ন তোলা হয় দলের ভেতরে বাইরে, তা কোনো ক্ষমতাহীন মানুষের জন্য হওয়া স্বাভাবিক নয়।

তারেক যদি সত্যিই দলের নেপথ্য ক্ষমতাধর একজন হয়ে থাকেন তাহলে এনিয়ে আশঙ্কার যৌক্তিকতা ছিল। নেপথ্য ক্ষমতাধরদের জবাবদিহিতা থাকে না। দলের

বিএনপি যে দাতা দেশ ও গোষ্ঠীর চাপকে অগ্রাহ্য করে যে সুবিশাল মন্ত্রিসভা গঠন করেছে তা তারেকের অনুগত তরুণ নেতাদের একোমোডেট করার জন্যই। মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী হিসেবে ঠাঁই পাওয়া এসব নেতাদের অনেকেই মন্ত্রীদের কার্যক্রমের ওপর ওয়াচডগের ভূমিকা পালন করেন

যুগ্মমহাসচিব হওয়ার পর তার কিছুটা হলেও জবাবদিহিতা থাকবে। কিন্তু তিনি কি এখানেই থেমে থাকবেন? প্রশ্নই আসে না। তারেক যে দল এমনকি দেশনায়ক হতে যাচ্ছেন তার ইঙ্গিত আরো আগেই দিয়েছেন বিএনপি'র কোনো কোনো নেতা। প্রশ্ন হচ্ছে এর প্রক্রিয়াটি কি হবে? এর চেয়েও বড় এবং তৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন খালেদা জিয়ার বর্তমানে তারেক জিয়াকে কতোবড় জায়গায় একোমোডেট করা সম্ভব বিএনপির পক্ষে, সেটি করতে গিয়ে কতোটা দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে বিএনপি দেশ শাসনের ক্ষেত্রে? দেশের সংবিধানের ওপর কতোটা আঁচড় ফেলা হতে পারে এটি করতে গিয়ে?

সংবিধান সংশোধনীর আশঙ্কা কেন

বিএনপি'র পক্ষে সবচেয়ে সহজে তারেককে বিশাল কোনো জায়গায় অধিষ্ঠিত করা সম্ভব সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে। জামাত বা জোটসঙ্গীদের সমর্থন ছাড়াই বিএনপি এই কাজটি করে ফেলতে পারে। সংবিধানের ১৪২ ধারা অনুযায়ী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা মানে সংবিধান পরিবর্তন করার মতো ক্ষমতা লাভ। বিএনপি'র একারই রয়েছে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

বিএনপি'র পক্ষে সংবিধান সংশোধনীর দিকে যাওয়ার আরো কারণ রয়েছে। বিএনপি (এবং দলের নেত্রী) বরাবরই রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার পক্ষপাতী হিসেবে পরিচিত ছিল। নব্বই-তে বিজয়ের পর বিএনপি সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার পক্ষে সংবিধান সংশোধনীতে রাজি হয় মূলত এরশাদ বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের সময়কার জনপ্রত্যাশার কারণে। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিএনপি ক্ষমতা-কেন্দ্রকে আরো সুসংহত করতে সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থায় ফিরে যেতে পারে নিয়মতান্ত্রিকভাবেই। রাষ্ট্রপতি পদকে ক্ষমতাবান করতে পারে সাংসদদের মাধ্যমে তাকে নির্বাচিত করার বিধান অক্ষুণ্ন রেখেই।

এভাবে ক্ষমতা সুসংহতকরণ করতে চাইলে আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিক কর্মকান্ডকে বিএনপি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। ২৯ জুন সংসদে প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন। অবসরপ্রাপ্ত সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতাদের সন্দেহজনক বৈঠকের কথা বলেছেন। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর নির্বাচনের ফলাফলকে অস্বীকার, সরকারকে তালেবান আখ্যায়িতকরণ, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের বিষয়কে অতিরঞ্জনকরণ-এর যে মরিয়া তৎপরতা চালিয়েছে, দলের নেত্রী বিভিন্ন সময়ে (বিশেষ করে ১৯৮২ এবং ১৯৮৬ সালে) যেভাবে বিএনপি সরকারকে উৎখাতকারী সামরিক সরকারকে সহযোগিতা করেছে, এমনকি '৯৬-এর আন্দোলনকালে যেভাবে সরকারি আমলাদের ব্যবহার করেছে তাতে এ ধরনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠলে তা উড়িয়ে দেয়ারও উপায় নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এধরনের ষড়যন্ত্র ঠেকানো কি বর্তমান সরকার কাঠামোর মধ্যেই সম্ভব নয় বিএনপি'র পক্ষে?

বি. চৌধুরীর প্রস্থান

বিএনপি যে ষড়যন্ত্রের কথা বলে থাকে তা কি ঘাপটি মেরে ছিল দলের ভেতরেও? এমন প্রশ্ন উঠেছে বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে দলের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে পরিচিত বদরুদ্দোজা চৌধুরীর রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগের মধ্য দিয়ে। তার ইমপিচমেন্ট দাবি করা হয়েছিল দলের পার্লামেন্টারি পার্টির সভায়, খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল তিনি দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে তার

সমাধিস্থলে যাননি, জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে উল্লেখ করেননি তার বিবৃতিতে। এজন্য একজন রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ করা যায় না। ইমপিচ বা সোজা বাংলায় অপসারণ করা যায় সংবিধান বিরোধী কিছু করলে বা গুরুতর নৈতিক স্খলন ঘটলে। বি. চৌধুরী তাই পদত্যাগ না করলে বিএনপি-কে প্রমাণ করতে হতো এধরনের কিছু করেছেন তিনি। বি. চৌধুরী এই দ্বন্দ্বের ধারে কাছে না গিয়ে আগেই পদত্যাগ করেছেন। তার পদত্যাগের পর দেশের আইনমন্ত্রী বলেছেন জিয়ার মাজার বা তাকে স্বাধীনতার ঘোষক না বলা নয়, বি. চৌধুরীর বিরুদ্ধে অন্য কোনো অভিযোগ ছিল। সেটি কি তা তিনি বলেননি। এই স্বচ্ছতা তার দলের ভেতরে নেই কেন এই প্রশ্নের মুখোমুখিও হতে হয়নি তাকে।

বিএনপি'র ইনসাইডার হিসেবে পরিচিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকের লেখায় বরং তার পদত্যাগের প্রেক্ষাপটের ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ক) তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য এই বলে ইনসিস্ট করেছিলেন প্রেসিডেন্ট হলে তার কাজের চাপ কম থাকবে, বয়সের কারণে তাই তার পছন্দ। খ) প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি সেমি-রিটায়ার্ড জীবন যাপনের পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার জনসংযোগ কর্মকান্ড বরং আরো বাড়িয়ে দেন। গ) আবদুর রহমান বিশ্বাসের মতো জি হুজুর টাইপের প্রেসিডেন্ট না হয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ ইমেজ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। ঘ) দলের মধ্যে এ নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়।

তার পদত্যাগের পর দেশের আইনমন্ত্রী বলেছেন জিয়ার মাজার বা তাকে স্বাধীনতার ঘোষক না বলা নয়, বি. চৌধুরীর বিরুদ্ধে অন্য কোনো অভিযোগ ছিল। সেটি কি তা তিনি বলেননি। এই স্বচ্ছতা তার দলের ভেতরে নেই কেন এই প্রশ্নের মুখোমুখিও হতে হয়নি তাকে

এই ব্যাখ্যাও খুব সন্তোষজনক মনে হয় না তার পদত্যাগের ক্ষেত্রে। বরং তার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তারেক জিয়ার সাড়ম্বর উত্থানে এটিও কারো কাছে মনে হতে পারে যে বিএনপি'র আগামী ক্ষমতাবিন্যাসের পরিকল্পনায় প্রেসিডেন্ট পদে বি.চৌধুরী আর ফিট-ইন করেন না। আওয়ামী লীগের অব্যাহত কুৎসা আর প্রচারণার প্রেক্ষিতে বিএনপির-ই নির্বাচিত একজন প্রেসিডেন্ট নিরপেক্ষ থাকার যৌক্তিকতাই মানতে রাজি নয় দলের নীতিনির্ধারকরা। এরচেয়ে বরং অনেক নিরাপদ মাইনাস বি. চৌধুরী ক্ষমতাবিন্যাস, যে বিন্যাসে দল আর সরকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরো সুসংহত থাকবে জিয়া পরিবারের হাতে। প্রশ্ন হচ্ছে এই ক্ষমতাবিন্যাস রূপায়িত করতে বিএনপি কি সত্যিই পদক্ষেপ নেবে সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তনের? প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি গ্রহণের?

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিপদ

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার গর্জন বিএনপি'র কেউ কেউ ইতিমধ্যে দিয়েছেন। বিএনপি'র নাজমুল হুদা এমনও বলেছেন যে ইচ্ছে করলে আওয়ামী লীগের রাজনীতি বন্ধ করে দিতে পারেন তারা। নাজমুল হুদার কথা অতিকথন মনে হওয়ার কারণ নেই। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিএনপি সংবিধানের প্রস্তাবনা ও ৮ (রাষ্ট্রের মূলনীতি) ৪৮ (রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা) ৫৬ ধারা ছাড়া যে কোনো বিধান পরিবর্তন করতে পারে। বিএনপি ইচ্ছে করলে উল্লেখিত ধারাগুলোও পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় ফিরে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনীর পর রাষ্ট্রপতি এতে সম্মতি দেবেন কিনা সেজন্য সাত দিনের মধ্যে গণভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। গণভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পক্ষে প্রদান করা হলে তিনি এতে সম্মতি প্রদান করবেন।

সংবিধান সংশোধন এখন কোনো কঠিন ব্যাপার নয় বিএনপি'র জন্য। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিপদ এখানেই। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে তাই বলা হয় ব্রুট মেজরিটি বা বন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই বন্যতার বিপদের কথা জানে সচেতন ভোটাররা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নায়ক উইনস্টন চার্চিলের কনজারভেটিভ পার্টি ব্রিটেনের নির্বাচনে বন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা ছিল ভোটারদের মনে। তাদের অতি সচেতনতার কারণে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা দূরের কথা, নির্বাচনে হেরেই যায় চার্চিলের দল।

বাংলাদেশের ভোটারদেরও জানা আছে বন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার তান্ডব। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগের প্রলোভন সামলানো যায়নি এমন নজির কম নয় উপমহাদেশে। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ভারতে এবং নওয়াজ শরীফের আমলে পাকিস্তানে এই ক্ষমতা প্রয়োগের তান্ডব দেখেছি আমরা। সুশাসন বা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার বদলে এই ক্ষমতা প্রয়োগ শাসন ও আইন কাঠামো বদলে দেয়, এর নজির বাংলাদেশেও দেখেছি আমরা। এটি বঙ্গবন্ধুর মতো দেশপ্রেমিক শাসকের আমলে যেমন হয়েছে, এরশাদের মতো স্বৈরাচার একনায়কের আমলেও হয়েছে। বঙ্গবন্ধু আমলে সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে জরুরি অবস্থা জারির বিধান করা হয়েছিল। চতুর্থ সংশোধনী করে দেশে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করে বাদবাকি সব রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। এরশাদ অষ্টম সংশোধনী করে উচ্চতর আদালতের কাঠামোই ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন, যা পরে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাষ্ট্রের মৌলনীতি পরিপন্থী এবং বেআইনি

বলে বিবেচিত হয়েছিল।

তারপরও এবারের নির্বাচনে বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। এটি যতোটা না দলের জনপ্রিয়তার কারণে, তারচেয়েও বেশি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের তান্ডবের কারণে। অর্থাৎ বিএনপি'র ভোট ছিল নেগেটিভ ভোট। সেই ভোট প্রদানের ক্ষেত্রেও কেউই সচেতন ছিল না যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে বিএনপি। এমন আশঙ্কা কোনো রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকও করেনি, সুশীল সমাজের কোনো অংশ থেকেও করা হয়নি। বিএনপিকে মানুষ ভোট দিয়েছে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করার জন্য। এজন্য বন্য ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজন নেই দলটির। কিন্তু তা প্রয়োগের প্রলোভন রয়েছে ঠিকই। বিএনপি কি তা করবে? খালেদা জিয়া যে ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন, তারেক জিয়াকে যেভাবে ফোরফ্রন্ট-এ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা কি সেই প্রলোভনের সম্ভাবনার দিকনির্দেশনা নয়?

বিএনপি'র ভেতরের রাজনীতি

খালেদা জিয়া এবারের সংসদ নির্বাচনে পাঁচটি আসন জিতে ধরে রেখেছেন বগুড়ার আসনটি। বগুড়া তার নিজের এলাকা নয়, তার নিজের এলাকা ফেনী। এর আগের দুটো সংসদ নির্বাচনে তিনি ধরে রেখেছিলেন বগুড়ার আসন নয়, ফেনীরই আসন। তাহলে তিনি এবার বগুড়ার আসন ধরে রেখেছেন কেন? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মনে এই প্রশ্ন এখন আসতে পারে। তিনি যদি কোনো কারণে এই আসন ছেড়ে দেন তাহলে এখানে নির্বাচন করবেন তারেক জিয়া। বগুড়াকেই তার নিজস্ব রাজনৈতিক স্ট্রংহোল্ড করতে চাচ্ছেন তারেক। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর এই হিসাব থেকেই কি বগুড়ার আসনটি ধরে রেখেছেন খালেদা জিয়া? সে সময় থেকেই কি রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় যাওয়ার অপশন খোলা রেখেছে বিএনপি?

বিএনপি সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় গেলে সেই রাষ্ট্রপতি হবেন খালেদা জিয়া। তবে তিনি শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে ধরনের ক্ষমতাহীন কিছু হবেন না। তার ক্ষমতায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে সংসদ আর মন্ত্রিসভা বাতিল করার ক্ষমতা। তিনি যদি তা করেন তাহলে তার ছেড়ে দেয়া আসনে জিতে সংসদ ও মন্ত্রিসভায় আসতে পারেন তারেক জিয়া। বিএনপি ও তারেক জিয়াকে সে সম্ভাবনার দিকে প্রভাবিত করার মতো উৎসাহী অনুগত বিএনপিতে নেই তাও নয়।

বিএনপিতে এছাড়া রয়েছে কট্টরপন্থী বলে পরিচিত একটি অংশ। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী, শাহরিয়ার কবিরের মতো সাংবাদিক কিংবা সর্বশেষ সাঈদ খোকনের মতো তরুণ নেতাকে গ্রেপ্তারে এরাই অগ্রণী ভূমিকা রাখে। ক্ষমতার তাণ্ডব এরাই দেখাতে পারে। এই তান্ডবের ঝড় সামলাতে এরাই এগিয়ে নিতে পারে রাজনীতিতে স্বল্পভিজ্ঞ তারেক জিয়াকে, পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করতে পারে সরকার পদ্ধতির।

এ সবই এখন পর্যন্ত স্রেফ সম্ভাবনা। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতি সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা এতোই কম, বিরোধী দলের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক এতোটাই মারমুখী যে এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। বিএনপি'র সামনে অন্য একটি অপশন হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠতার তান্ডব না দেখিয়ে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তিমত্তাকে কল্যাণমুখী রাজনীতিতে ব্যবহার করা। বিরোধী দলের মোকাবেলার চেয়ে আরো বেশি ফোকাস করা নিজের জনপ্রিয়তা ধরে রাখার ওপর। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন করা। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-শিল্প উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করা। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ তরুণ ভোটারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এ জন্য সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি গ্রহণ করা। তারুণ্যের প্রতিনিধি হিসেবে তারেক জিয়ার মতো নেতার আগমনকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে রাখা।

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে বন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রূপায়িত না করলে তা বিএনপি'র জন্য যেমন, দেশের জন্যও তেমনি মঙ্গলকর হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কোনো উদ্যোগ নেই।

বিএনপিকে মানুষ ভোট দিয়েছে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করার জন্য। এজন্য বন্য ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজন নেই দলটির। কিন্তু তা প্রয়োগের প্রলোভন রয়েছে ঠিকই। বিএনপি কি তা করবে?